CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM-V CC-12: Indian Political Thought-I
TOPIC– VII : ABUL FAJAL - MONARCHY
আবুল ফজল –রাজতন্ত্র

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

আবুল ফজল – রাজতন্ত্র

জিয়াউদ্দিন বারানির বিবরণে যেমন সুলতানি যুগের রাষ্ট্রভাবনার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, মোগল যুগের রাষ্ট্রচরিত্র ও সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সংক্রান্ত সাধারণ পরিচয় জানার জন্য নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় শেখ আবুল ফজল (1551-1602) এর কাছ থেকে। বাদশাহ আকবর-এর স্নেহধন্য ও প্রিয়পাত্র আবুল ফজল ছিলেন মোগল যুগের অন্যতম রাষ্ট্রদার্শনিক। বারানির তুলনায় আবুল ফজল-এর মোগল যুগ সংক্রান্ত বিবরণ ছিল অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ, ধর্মের অনুশাসনমুক্ত, এবং সুশৃঙ্খল বৌদ্ধিক বিশ্লেষণপ্রসূত। অবশ্য তার বিবরণে বাদশা আকবর-কে একজন মহান শাসক হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রবণতাও দেখা যায়। তিনি পার্থিব শাসককেই রাষ্ট্র-সার্বভৌমিকতার প্রতিভূ হিসেবে দেখিয়েছেন। তার মতে শাসকই ঈশ্বরের ন্যস্ত ক্ষমতা ভোগ করার একমাত্র অধিকারী। আবুল ফজল কখনই রাজনীতিকে ধর্মভিত্তিক বলে মনে করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই রাষ্ট্রচরিত্র ও সার্বভৌমিকতার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর চোখে ইসলাম ধর্ম হলো পরমতসহিষ্ণ, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম ভাতৃত্বে বিশ্বাসী । তিনি ইসলামের ভারতীয়করণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। আবুল ফজল-এর পূর্বপুরুষেরা নবম শতকে সিন্ধু অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তার পিতা ধর্মনিষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তি বলেই পরিচিত ছিলেন এবং এমন এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন যা ইসলামের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলার বিরোধিতা করেছিল। সুফীসন্ত শেখ সেলিম চিস্তির হস্তক্ষেপে আবুল ফজলের পিতা উলেমাদের দ্বারা উত্তেজিত রাজরোষ থেকে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে আবুল ফজল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা লাভ করেন। তেইশ বছর বয়সে (1574) বাদশা আকবর-এর সঙ্গে আবুল ফজলের সাক্ষাৎ হয়। কালক্রমে বাদশাহের স্নেহধন্য পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ যোগ্যতার জন্য তিনি মোগল দরবারের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন।

আবুল ফজল বিশ্বাস করতেন বাদশাহ শুধু পার্থিব জগতেরই প্রধান নন, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। বাদশাহ-কে আবুল ফজলের যে বক্তব্যটি আকৃষ্ট করেছিল তা হলো বাদশাহ শুধুমাত্র ইসলামের রক্ষক নন, তিনি সাম্রাজ্যের প্রতিটি মানুষের ও সমগ্র মানবজাতির রক্ষক। পরবর্তীকালে আকবর ‘দীন-ই-ইলাহি’ নামে নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন এবং বাদশাহ হলেন সেই ধর্মের জাগতিক

ক্ষেত্রের খলিফা। গোড়া-মুসলিমদের কাছে আবুল ফজল কালক্রমে ধর্ম সম্পর্কে অগ্নি উপাসক ও মুক্তমনা হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবুল ফজল দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেখানে আকবর-পুত্র সেলিম এর চক্রান্তে আবুল ফজল-কে হত্যা করা হয়, কারণ তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতার দর্শন বাদশাহের দরবারের অনেকের কাছেই তাকে অপ্রিয় করে তুলেছিল। যদিও আবুল ফজল রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গ্রন্থ লেখেননি, তবুও তাকে রাষ্ট্রদার্শনিক বলে গণ্য করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তিনি রাজতন্ত্রকে একটি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন এবং তাকে সূর্য কিরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা পৃথিবীকে আলোকিত করে। তার মতে শাসক রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন হলো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার পথ। তিনি উলেমাদের ওপরে বাদশাহের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।

আবুল ফজল ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং মনে করতেন বাদশাহই হলেন ন্যায়বিচারের উৎস। সমাজে প্রতিযুগই সুবিচার (Justice) এবং ন্যাজ্যতা (fulness)-এর নিজস্ব মানদণ্ড বা সংজ্ঞা তৈরী করে নেয়। বিচার বিভাগের কাঠামো এবং বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে বিচার প্রক্রিয়া প্রতিযুগে ভিন্ন ভিন্ন রপে দেখা যায়। মধ্যযুগে ভারতে তুর্কে-আফগান সুলতানরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, ফলে তাদের সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কিত গানধারণা ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

'ইসলাম' কথাটির অর্থ হল শান্তি অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। কুরআন-কে দৈবী বাণী বলে মনে করা হয় যা পয়গম্বরের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলিম আইনের অন্যতম উৎস হলো 'হাদিশ' অর্থাৎ পয়গম্বরের অলিখিত বাণী যার ব্যাখ্যা দেন খলিফা। আবুল ফজল এবং ঐতিহাসিক *ভিনসেন্ট স্মিথ* উল্লেখ করেছেন যে, বাদশাহ আকবর প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার করায় আগ্রহী ছিলেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে ইলতুৎমিস, শেরশাহ, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব একইভাবে নিজে ন্যায়বিচার করায় আগ্রহী ছিলেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম আইন এবং বিধিসমূহ বর্তমান যুগের মতো লিখিত না থাকায় বিভিন্ন শাসকের হাতে ন্যায়বিচার ভিন্ন ভিন্ন হতো। কিন্তু সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায় যে মধ্যযুগে ভারতের বিচার ব্যবস্থায় শাসকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের মনে ব্যাপক হারে অসন্তোষ ছিল না। বাদশাহ আকবর-এর মতোই আবুল ফজলও মনে করতেন আইন ও ন্যায়বিচারের গতিপথ স্বৈরতান্ত্রিক পথে অবরুদ্ধ করা কোন মতেই উচিত নয়। আকবর -এর আদর্শবাদী রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান শরিক ছিলেন আবুল ফজল। সেই ভূমিকায় তিনি অনেক অর্থেই রাষ্ট্রপরিচালনায় বাদশাহর আদর্শের অন্যতম প্রধান ব্যাখাকার ছিলেন। তিনি তার বাদশাহকে ঈশ্বরের 'অবতার' বলে ভাবনে নি, কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর দৈবী ইচ্ছার দূত ছিলেন আকবর যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন।

আবুল ফজল মধ্যযুগের ভারতে অমর হয়ে উঠেছিলেন তার রচিত *'আকবরনামা'* গ্রন্থটির জন্য যেখানে তিনি সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে আকবর-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ গ্রথিত করেন। এই গ্রন্থের

শেষ খণ্ড 'আইন-ই-আকবরী' নামে সুবিখ্যাত। তথ্যমূলক এই গ্রন্থে বাদশাহ আকবর-এর শাসন কাঠামো ও পদ্ধতির খুঁটিনাটি বর্ণনা করা আছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ব্যবস্থা, সেনা পরিচালনা, আইন, শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা, হিন্দুদের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, সাধু সন্তদের পরিচয় আলোচিত হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ গবেষক-পণ্ডিতগণ 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আবুল ফজলের বৃহত্তর রাষ্ট্রদর্শনে হিন্দু ও পারসিক প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি মনে করতেন মানুষ দুনীতিগ্রস্থ ও হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় সমাজে মাৎসন্যায় অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তখন রাজার অপরিহার্যতা অনুভূত হয় সমাজে সুশৃঙ্খল স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। সেজন্য বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার নিশ্চিত প্রতিষেধক হলেন রাজা। প্রকৃতপক্ষে আরবি শব্দ 'পাদশাহ'র ব্যুৎপত্তিাত অর্থ হলো—স্থায়িত্ব (পাদ) এবং উৎস বা প্রভু ('শাহ')। পাদশাহ' শব্দের অন্য অর্থ হলো বিশ্বের পতি যিনি সকলের কাছে পূজ্য। 'পাদশাহ' শব্দটির রূপান্তরিত শব্দ হলো বাদশাহ। 'আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল স্পষ্ট করে বলেছে, মানুষের প্রকৃতিভেদে প্রজাদের সঙ্গে সর্বোচ্চ শাসক বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার করবেন। তিনি জ্ঞানী ও সদাশয় ব্যক্তিদের সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ করবেন; সুস্থ প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন কিন্তু তাদের ওপর বেশি বিশ্বাস। স্থাপন করবেন না ; যাদের মধ্যে কোন প্রতিভা নেই কিন্তু অপরের ক্ষতি করেন না এমন ব্যক্তিদের বাদশাহ গুরুত্ব দেবেন না এবং তাদের নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন ; যারা অবিবেচক ও বিলাসবহুল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত কিন্তু অপরের ক্ষতি করে না তাদের বাদশাহ ভৎর্সনা করবেন এবং যথোচিত উপদেশ দিয়ে তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করবেন ; আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ যারা কুকর্ম করে অপরের সার্বিক ক্ষতি করে এবং দুর্দশার কারণ হয় তাদের বাদশাহ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন, প্রয়োজন হলে উদাহরণমূলক চরম দৈহিক শাস্তি দেবেন কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, কেননা মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব।

তিনি রাজতন্ত্রের দুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ করেন প্রকৃত রাজতন্ত্র ও বিকৃত রাজতন্ত্র। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজা অবশ্যই এই দুই শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবেন। তিনি স্বীকার করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই প্রজার মঙ্গলাকাঙ্খী এবং স্বৈরাচারী, স্বার্থন্বেষী বিকৃত রাজার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ নয়। তবে সাধারণত প্রকৃত রাজার রাজ্যে রাজভাণ্ডার বা রাজকোষ সুরক্ষিত থাকে এবং সৈন্যবাহিনী সন্তুষ্ট ও কর্মকুশলী হয়। এমন রাজা শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন উভয় ব্যাপারে সদাজাগ্রত থাকেন, ফলে রাজ্যে মানুষের মধ্যে সত্য, শিষ্টাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, দায়িত্বশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। আর বিকৃত রাজার রাজ্যে মানুষের মধ্যে আত্মশ্লাঘা, ভোগাকাঙ্খ, অর্থলিপ্সা, তোষামোদপ্রিয়তা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ফলে রাজ্যে অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা, হিংসা, চৌর্যবৃত্তি বৃদ্ধি পায়।

আবুল ফজল মন্তব্য করেন যে একজন আদর্শ রাজার চাক্ষুস প্রতিমূর্তি হলেন বাদশাহ আকবর যাকে তিনি আল্লাহর দূত বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তিনি সব মানুষকেই অন্ধকার ও অরাজকতা থেকে

মুক্তি দেবেন। আকবর-এর হাতে সর্বোচ্চ পার্থিব ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা একীভূত থাকায় আবুল ফজল খুশী হয়েছিলেন। কারণ তার মতে, এই দুই ধরণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দুজন পৃথক ব্যক্তির হাতে থাকলে সমাজে বিবাদ-বিগ্রহ ও বিভ্রান্তি দেখা দেবে। রাজাই তার সময়ের যুগমানস ও যুগশক্তিকে যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম এবং তিনি তদনুযায়ী নিজের ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

আবুল ফজল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে একটি পরিবার হিসেবে কল্পনা করেন যেখানে রাজা-প্রজার সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতোই। ঈশ্বরের অনুরক্ত থেকে রাজা তার প্রশস্ত হৃদয়ানুভূতি দিয়ে প্রজার মঙ্গল কামনা করবেন এবং একইসঙ্গে প্রজা দোষত্রুটি ও অপরাধ কালে তার উপযুক্ত শাস্তিবিধানও করবেন। তার মনে আদর্শ রাজা পার্থিব ক্ষমতা ও ধনদৌলতের পেছনে ছুটবেন না, অত্যাচারী হবেন না, রাজনীতির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ডুবে থাকবেন না। তাকে হতে হবে রাষ্ট্রনায়ক যিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে রাষ্ট্রের স্থায়ী মঙ্গল সাধনে ব্রতী থাকবেন। রাজ্যশাসনে নীতি-নির্ধারণ ও নীতি রূপায়নে তিনি প্রাগসর সমাজ নেতাদের এবং রাজদরবারের বিশিষ্টজনদের মধ্যে শুভবুদ্ধিভিত্তিক সহমত গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। আর তাইতো তার রাজসভায় যর্থার্থ নবরত্নের সমাহার করেছিলেন। আবুল ফজল-এর মতে রাজার নৈতিক কর্তব্য হলো তার রাজসভা ও পরামর্শদাতা গোষ্ঠীতে চার ধরণের যোগ্যতম ব্যক্তিদের (রত্ন) মনোনীত করা:
(ক) রাজ্যের সংস্কৃতি সম্পন্ন, জ্ঞান ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ;
(খ) সামরিক কাজে রাজাকে জয় এনে দিতে সক্ষম ব্যক্তিদের ;
(গ) রাজাকে ধর্ম-সংস্কৃতি-নৈতিকতা-বিজ্ঞান বিষয়াদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখতে সক্ষম সভাসদদের এবং
(ঘ) রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক কারিগর শ্রেণীর মানুষদের
এই চার ধরণের মানুষদের গুণাগুণ বিবেচনা করে রাজার পক্ষে আসলে রাষ্ট্রচরিত্রের উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভব হবে। রাজার চারপাশে যদি শুধুই স্বার্থান্বেষী, চাটুকার, লোভী, নীতিহীন ও অযোগ্য লোকেরা ভীড় করে থাকে তাহলে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যে অবনতি অবধারিত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের চারিত্রিক বিশ্লেষণে এটাই ছিল আবুল ফজল-এর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বক্তব্য।

আবুল ফজল সম্প্রদায়গত বিরোধের পরিবর্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবুল ফজল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন, ‘দীন’ (ধর্মীয় জগত) ও ‘দুনিয়া’ (পার্থিব জগত) উভয় শ্রেণীর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেলে মানুষের প্রকৃত চেতনা (অর্থাৎ জ্ঞান-প্রজ্ঞা) নীচ মনোবৃত্তিরূপ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় এবং তখনই পারস্পরিক হানাহানি শুরু হয়। মানব চরিত্রের এই বিশ্লেষণ করে তিনি চেয়েছিলেন যাতে ঈশ্বরের মহিমা বা দ্যুতি বুঝতে ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিমূর্তি রাজাকে মান্য করে 'দীন' ও 'দুনিয়ার' বিরোধ মেটানো যায়। শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত এবং ধর্মান্ধ সমাজের এই দুই অংশকে যথোচিত নিয়ন্ত্রণ করেই রাজা ও তার প্রশাসন সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারেন।

***